ক্রুসেড বিশ্বকোষ - ৫

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

# মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

ক্রুসেড বিশ্বকোষ-৫

# মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস

## দ্বিতীয় খণ্ড

মূল : ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

যায়েদ আলতাফ

মানসূর আহমাদ

সম্পাদক

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৩৫০, US $ 18. UK £ 13

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
**কালান্তর প্রকাশনী**
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

**ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র**
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
**নহলী**, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
**রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ**
মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96590-2-0

**Mongol o Tatarder Etihas**[2nd Part]
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
**Kalantor Prokashoni**
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

**All Rights Reserved**
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

# প্রকাশকের কথা

ইতিহাস বার বার ফিরে আসে, কথাটা জ্বলন্ত সত্য। যে কালপর্ব আমরা অতিক্রম করছি এবং আত্মবিস্মৃতির যে জীবন আমরা যাপন করছি—মুসলমানদের করুণ ইতিহাস আবারও যে ফিরে আসছে, সেটা ভাবার যথেষ্ট কারণ ও কার্যকারণ তাতে রয়েছে। ফিলিস্তিন, আরাকান, ইরাক, সিরিয়া, পূর্ব তুর্কিস্তান আর কাশমিরে বয়ে চলছে রক্তের নদী। পৃথিবীর প্রায় পুরো মানচিত্রে, প্রতিটি জনপদে নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলিমের অশ্রুধারা, রক্তমাখা ছবি। তাদের বুকফাটা আর্তনাদ, আহাজারি প্রকম্পিত করে তুলছে আকাশ—খোদার আরশ। মনে হচ্ছে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে সেই চেঙ্গিসি ঝড়—খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে যা উঠে এসেছিল গোবির তৃণহীন মরুভূমি থেকে। আকাশ আঁধার করে-আসা সেই সর্বনাশা ঝড়ের কালো ছায়া এসে পড়েছিল শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ও জাতির ঐক্যের কেন্দ্রভূমি বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসি খিলাফতের ওপর; কিন্তু বিতর্কপ্রিয় অচেতন জনগোষ্ঠীর কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি সে দিন। সতর্ক হয়নি সে ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্য। একসময় সেই ঝড় প্রচণ্ড আকার ধরে আছড়ে পড়ে খাওয়ারিজমের ওপর এবং ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এই শক্তিমান ও সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যকে; কিন্তু খাওয়ারিজমের করুণ অবস্থা দেখেও সতর্ক হওয়ার গরজ অনুভব করেনি পাশের বাগদাদ। ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়। মোঙ্গল ও তাতার নামক সেই প্রলয়ংকরী তাণ্ডবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিশাল আব্বাসি খিলাফত। পুরো মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ত্রাস, শঙ্কা আর উৎকণ্ঠা। রক্তের স্রোতে তলিয়ে যেতে থাকে দারুল খিলাফাহ বাগদাদ। তৎকালে সারা বিশ্বের বিদ্যার্থীদের জ্ঞানকেন্দ্র হয়ে ওঠা দারুল হিকমার সমস্ত গ্রন্থ অশিক্ষিত-বর্বর মোঙ্গলরা ফেলে দেয় দিজলা ও ফুরাতে, গ্রন্থের কালিতে কালো হয়ে যায় নদীর পানি। জীবিতরা আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকে মিসরের দিকে—মামলুক সুলতানের আশ্রয়ে।

মানুষ মনে করেছিল তাতারঝড় একটা খোদায়ি গজব, কিয়ামত-পূর্ব ইয়াজুজ-মাজুজের বাহিনী। কেউ কেউ ভাবছিল এরা দাজ্জালের বাহিনী; তাই মানুষের সাধ্য নেই এই ঝড় মোকাবিলার। মুসলিমবিশ্বের ওপর বয়ে-যাওয়া এ তাণ্ডব দেখে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল ইউরোপও। হ্যারল্ড ল্যাম্বের ভাষায়, 'সুইডেন ও ভেনিসের জেলেরা তাতারদের ভয়ে সাগরে মাছ ধরার নৌকা ভাসাতে ভয় পেত।'

জাতিকে রক্ষার জন্য তখন প্রয়োজন ছিল এমন একজন নেতার, যার মধ্যে থাকবে

জিহাদের পূর্ণ জজবা। ইমান হবে পাথরের চেয়ে কঠিন ও দৃঢ়, সাহস থাকবে পাহাড়ের চেয়ে উঁচু; আর জাতির প্রতি প্রেম ও দরদে দিলটা থাকবে সাগরের চেয়ে বিশাল ও গভীর। সেই ক্রান্তিকালে মহান আল্লাহ মামলুক সুলতানদের থেকে চয়ন করে নিয়েছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুজ নামের এক মুজাহিদকে, যিনি ইমান ও জিহাদের মাঠে আবির্ভূত হয়েছিলেন ধূমকেতুর গতি নিয়ে। আইন জালুতের মহারণে চির-অজেয় আখ্যা পাওয়া তাতারদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়ে উম্মাহর স্বপ্নের আকাশে উদয় হয়েছিলেন ধ্রুবতারা হয়ে। পালটে দিয়েছিলেন ইতিহাসের মোড়। ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে মুসলমানদের গৌরবময় হারানো অতীত।

ইতিহাসকে তুলনা করা হয় আয়নার সঙ্গে। ইতিহাসের পাতায় দেখে নিতে হয় অতীতের উত্থানের কারণ, পতনের প্রধান নিয়ামক। জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে অনুসরণ করতে হয় সেই উত্থানের মাধ্যমগুলোর এবং পরাজয় থেকে বাঁচতে হলে পরিহার করতে হয় পতনের কারণসমূহ। এমনই এক ইতিহাস হচ্ছে মামলুক সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ রাহ.-এর জীবনেতিহাস।

এটি 'ক্রুসেড বিশ্বকোষ' সিরিজের পঞ্চম সিরিজ *মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। গ্রন্থটির লেখক বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি এ অংশটি প্রকাশ করেছেন—মোঙ্গাল ও তাতারদের ইতিহাসের অংশ হিসেবে; আবার *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ* নামে আলাদাভাবেও। তাই আমরাও লেখকের অনুসরণে দুভাবেই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছি। তাই এটি হবে *মোঙ্গাল ও তাতারদের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড); আবার *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ দ্য ব্যাটালিয়ন* নামেও প্রকাশিত হলো।

গ্রন্থটি বিষয়-বিবেচনায় যথেষ্ট কঠিন এবং ভাষিক উপস্থাপনায় সৌকর্যপূর্ণ ও আলংকারিক। অনেকেই এমন গ্রন্থ অনুবাদে হিমশিম খেয়ে যান। মানুষের নাম, জায়গার নাম, জিনিসপত্রের নাম, তারিখ ইত্যাদি এতই জটপাকানো যে, হিমশিম খাওয়া আশ্চর্যের কিছু না; কিন্তু মানসূর আহমাদ তার যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে যথেষ্ট সাবলীলতার সঙ্গে গ্রন্থটির অনুবাদ সমাপ্ত করেছেন। ভূমিকা অনুবাদ করেছেন যায়েদ আলতাফ। সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ লেখক আবদুর রশীদ তারাপাশী। দ্বিতীয় সংস্করণের ভাষা ও বানানের কাজ করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত।

আমরা আমাদের চেষ্টায় কতটুকু সফল সেটা নিরীক্ষণ করবেন পাঠকসমাজ। আশা করব, যেকোনো পর্যায়ের ভুলত্রুটি নজরে এলে কালান্তরকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ কালান্তর আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

**আবুল কালাম আজাদ**
কালান্তর প্রকাশনী
২২ ডিসেম্বর ২০১৯

# অনুবাদকের কথা

বাংলাদেশে সঠিক ইতিহাসচর্চা খুবই কম হয়। পাঠ্যবইয়ে জোর করে ইতিহাস গেলানো হলেও স্বতঃপ্রণোদিত ইতিহাসচর্চা হয় না বললেই চলে। আমরা অনেকেই *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ার* নাম শুনেছি; কিন্তু পড়েছি কজন? আর পড়ব দূরের কথা, নামই-বা জানি কয়টি গ্রন্থের! যখন দেখি বড় বড় আলিম পর্যন্ত সাইফুদ্দিন কুতুজের নামটা জানেন না, তখন দুঃখে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে হয়। ইতিমধ্যে দুজন মুহাদ্দিস আলিমকে 'ইদানীং কী লিখছ?'—প্রশ্নের জবাবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির নাম জানিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উভয়কেই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়েছে সাইফুদ্দিন কুতুজ কে ছিলেন, কী ছিলেন!

আমরা হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদের সুবিশাল পাঠাগার ধ্বংসের কাহিনি খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারি; কিন্তু সেই হালাকুর বাহিনীকে যিনি পরাজিত করলেন, তাঁর নামটা পর্যন্ত জানি না—আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে! একটা জাতি যদি নিজেদের পূর্বসূরিদের না চেনে, তারা কীভাবে শিক্ষা নেবে! কোন পরিস্থিতিতে কী পদক্ষেপ নিতে হয়, তা জানবে কীভাবে! পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে অজ্ঞ জাতি কীভাবে জেগে উঠবে! ইতিহাস তো অতীতের আয়নায় ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা।

ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি একজন আরব-ইতিহাসবিদ। বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের কাছে একজন গ্রহণযোগ্য ইতিহাস-বিশ্লেষক। মুসলিম উম্মাহকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে, উম্মাহর সিংহপুরুষদের বীরত্বের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দিতে এবং পূর্বসূরিদের অনুসৃত রীতিতে জাগিয়ে তুলতে তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস প্রয়াস।

আমাদের এ গ্রন্থটি তাঁর রচিত *আল-মুগুল বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড। এর গুরুত্ব বিবেচনা করে ড. সাল্লাবি যেভাবে একে *সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ* নামে আলাদা গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন, তেমনিভাবে আমরাও আলাদাভাবে প্রকাশ করেছি।

### গ্রন্থটির অনুবাদে অনুসৃত নীতি : কিছু কৈফিয়ত

- 'কুতুজ' বানানের ক্ষেত্রে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন। 'কুতয' 'কুতুয' 'কুতুজ'—কোনটা শুদ্ধ? আমরা কুতুজ বানানে কেন লিখলাম? আমাদের

অনুসন্ধান অনুযায়ী আরবি নামে ত্বা বর্ণে পেশ আছে। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ ড. কাসিম আবদুহু রচিত কুতুজের জীবনীতে 'ত্বা' বর্ণে পেশ দিয়ে লেখা হয়েছে। তা ছাড়া ইংরেজি উইকিপিডিয়ায় সরাসরি Qutuz বানানে লেখা হয়েছে। তাই আমরা মনে করি, কুতয বানানের চেয়ে কুতুয/কুতুজ অধিক বিশুদ্ধ। আর যেহেতু গ্রন্থটিতে আমরা প্রমিত বাংলা বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তাই অন্তস্থ য-য়ে না লিখে বর্গীয় জ-য়ে লিখেছি। এই হিসেবে কুতুয বানানটা চলনসই হলেও কুতুজ বানানই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

- এভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অধিক গ্রহণযোগ্য ও অধিক বিশুদ্ধ বানান গ্রহণের চেষ্টা করেছি। যেমন, তাতারি না লিখে তাতার লিখেছি।
- হাদিসের সূত্রের ক্ষেত্রে টীকায় শুধু গ্রন্থের নাম ও হাদিস-নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।
- তথ্যসূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে পাশাপাশি একই গ্রন্থের নাম ও পৃষ্ঠানম্বর এলে শেষেরটা রাখা হয়েছে।
- পাঠকের প্রয়োজন ও উপকারের কথা ভেবে অনুবাদক বা সম্পাদকের পক্ষ থেকে কিছু টীকা সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।
- ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আরবিতে অনেক সময় কবিতা উদ্ধৃত করা হয়। বাংলায় সেগুলোর তেমন প্রয়োজন না থাকায় কিছু কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির অনুবাদের শুরু থেকে প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেক ভাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সুলতান কুতুজের অলংকারপূর্ণ দুর্বোধ্য একটি চিঠির মর্ম উদ্ধার করে দিয়েছেন মিসরে অধ্যয়নরত দিলওয়ার মিলকি ও আরও তিনজন, তাঁদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়াও অনেকে গ্রন্থের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন, বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন; সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে মিনতি, তিনি যেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং আমাদের সবাইকে তাঁর দীনের জন্য কবুল করেন। আমিন।

**মানসূর আহমাদ**
১৮ মে ২০১৯
gelpenbd@gmail.com

# ধা রা ক্র ম


লেখকের কথা # ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

**মামলুক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন # ৩৭**

প্রথম পরিচ্ছেদ

**মামলুকদের উৎস ও উত্থান** **৩৯**

এক : মামলুক কারা ৩৯

১. নাজমুদ্দিন আইয়ুব ও মামলুকগণ ৪২

দুই : মামলুকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদীক্ষা-পদ্ধতি ৪৬

১. প্রথম স্তর ৪৭

২. দ্বিতীয় স্তর ৫১

৩. তৃতীয় স্তর ৫২

৪. খাওয়াপরা ও বিশ্রামের নিয়মাবলি ৫২

৫. ডিগ্রি ও শিক্ষাসমাপ্তির নিয়মকানুন ৫৩

৬. মামলুকদের ভাষা ৫৩

৭. মামলুকদের মধ্যে 'উসতাজ' সম্পর্ক ৫৪

৮. খুশদাশিয়া (সাথি) সম্পর্ক ৫৫

৯. তারা কি বহিরাগত ৫৫

১০. আধুনিক মিলিটারি অ্যাকাডেমি ৫৬

১১. মামলুক আমিরবিক্রেতা শায়খ ইজ্জুদ্দিন ৫৬

১২. অনন্যদের যুগ ৫৯

তিন : সপ্তম ক্রুসেড মোকাবিলায় মামলুকদের প্রচেষ্টা ৬০

১. মানসুরার যুদ্ধ ৬২

২. যুদ্ধের নেতৃত্বে তুরানশাহ ৬৩

৩. মামলুকদের বীরত্বের চিত্র ৬৫

৪. বন্দিত্ব ও সন্ধির শর্তাবলির মধ্যে নবম লুই ৬৬

৫. সপ্তম ক্রুসেড অভিযানে ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ ৬৭
৬. সপ্তম ক্রুসেডের ফল ৬৭
৭. তুরানশাহকে যেভাবে হত্যা করা হয় ৭২
চার : আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ৭৪
১. সংশোধন-সংস্কারের পথ পরিহার ৭৭
২. জুলুম ৮০
৩. বিলাসিতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ৮৩
৪. পরামর্শসভা বন্ধ করে দেওয়া ৮৫
৫. আইয়ুবি পরিবারে গৃহবিবাদ ৮৬
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ৮৭
৭. সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক প্রবাহ তৈরিতে আইয়ুবিদের ব্যর্থতা ৮৯
৮. কেন্দ্রীয় প্রশাসনে দুর্বলতা ৯০
৯. গোয়েন্দাবিভাগের দুর্বলতা ৯১
১০. রাজনৈতিক অঙ্গনে আল্লাহভীরু আলিমদের অনুপস্থিতি ৯২
১১. নাজমুদ্দিন আইয়ুবের মৃত্যু এবং যোগ্য উত্তরসূরির অভাব ৯৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**মামলুকদের রাজত্বে শাজারাতুদ দুর ও ইজ্জুদ্দিন আইবেক ৯৫**
এক : শাজারাতুদ দুর ৯৫
১. শাজারাতুদ দুর আইয়ুবি ছিলেন নাকি মামলুক ৯৫
২. মিসর-সম্রাজ্ঞী ৯৬
৩. তাঁর জন্য দুআ ৯৭
৪. তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা ৯৮
৫. তাঁর অভিষেক ৯৮
৬. শাজারাতুদ দুরের ক্ষমতারোহণকে সবার প্রত্যাখ্যান ৯৮
৭. শাজারাতুদ দুরের পদত্যাগ ৯৯
৮. ইসলামে নারী-নেতৃত্বের হুকুম ১০০
দুই : ইজ্জুদ্দিন আইবেকের রাজত্ব ১০৩
১. আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের শঙ্কা ১০৪
২. মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যকার যুদ্ধ ১০৭
৩. মামলুক ও ক্রুসেডারদের মধ্যে চুক্তি ১০৮
৪. আব্বাসি খলিফার সমঝোতা-প্রচেষ্টা ১০৯
৫. মামলুকদের বিরুদ্ধে আরবীয় মিসরিদের বিদ্রোহ ১১০
৬. মামলুক সহকর্মীদের থেকে শঙ্কা এবং আকতাই হত্যা ১১৫

৭. সুলতান আইবেক ও শাজারাতুদ দুরকে হত্যা ১১৮
৮. আলি ইবনুল মুয়িজের রাজত্ব ও কুতুজের কর্তৃত্বগ্রহণ ১২২
৯. স্বরাষ্ট্র-বিষয়ে সাইফুদ্দিন কুতুজের পদক্ষেপ ১২৭

## চতুর্থ অধ্যায়

## আইন জালুতযুদ্ধ ও তাতারদের পরাজয় # ১২৯

### প্রথম পরিচ্ছেদ

**বিলাদুশ শাম ও জাজিরায় তাতারদের দখলদারত্ব ১৩১**
এক : সিলভানের (Mayafarikin) প্রতিরোধ ১৩১
১. তাতারদের মুখোমুখি আমিদ নগরী ১৩১
২. মায়াফারিকিন কর্তৃক তাতারদের চ্যালেঞ্জ ১৩২
৩. কামিল কর্তৃক তাতারদের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ ১৩৩
৪. নাসির কর্তৃক কামিল আইয়ুবির পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান ১৩৩
৫. সিলভানের পতন ও কামিল আইয়ুবির শাহাদাত ১৩৫
৬. মারদিন ১৩৮
দুই : প্রতিরোধ ও আত্মসমর্পণে দ্বিধান্বিত নাসির ইউসুফ ১৪০
১. হালাকু কর্তৃক বাদশাহ নাসিরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ১৪০
২. মামলুকদের কাছে নাসিরের সাহায্য কামনা ১৪২
৩. হালাবের পতন ১৪৩
৪. দামেশক ১৪৭
৫ .বাদশাহ নাসির আইয়ুবির শেষ পরিণতি ১৫১

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**আইন জালুতযুদ্ধের পূর্বাভাস ও এর ঘটনাসমূহের অগ্রগতি ১৫৪**
এক : মিসর দখল করা তাতারদের কৌশলগত লক্ষ্য ১৫৪
দুই : মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধকরণে কুতুজের পদক্ষেপ ১৫৫
তিন : সাইফুদ্দিন কুতুজের প্রতি হালাকুর চিঠি ১৬৩
১. যুদ্ধের পরামর্শসভা ১৬৬
২. সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা ১৬৭
৩. হালাকুর দূত হত্যা ১৬৮
চার : চূড়ান্ত দিন ১৭০
১. যুদ্ধের আগে ১৭০
২. মুসলিমবাহিনীর পদক্ষেপ ১৭১

৩. গাজার যুদ্ধ ১৭১
৪. গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা-তথ্যাবলি ১৭৩
৫. মামলুক-মোঙ্গলদের মধ্যে তুমুল লড়াই ১৭৪
৬. মোঙ্গল-সেনাপতির বীরত্ব ১৭৬
৭. দামেশক ও বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ ১৭৮
৮. দামেশকে সাইফুদ্দিন কুতুজের আগমন ১৮০
৯. শামের শাসনক্ষমতা সুবিন্যস্তকরণ ১৮১
১০. পরাজয়ের পর হালাকুর পদক্ষেপ ১৮২
পাঁচ : কুতুজ হত্যা ১৮৩
১. কুতুজ হত্যার কারণ ১৮৫
২. মামলুকদের সিংহাসনে আরোহণের পদ্ধতি ১৮৭
৩. কুতুজ হত্যার ফল ১৮৮
৪. কুতুজের সমাধি ও ইজ ইবনু আবদুস সালামের প্রশংসা ১৯০
৫. মোঙ্গলদের পুনরাক্রমণ ১৯১
ছয় : আইন জালুতে মুসলমানদের বিজয়ের কারণ ১৯৩
১. বিচক্ষণ নেতৃত্ব ১৯৩
২. কুতুজের ছিল বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইমানি দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৬
৩. যোগ্য লোকের কাছে দায়িত্ব অর্পণ ২০১
৪. শক্তিশালী বাহিনী ২০৪
৫. জিহাদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি ২০৫
৬. প্রস্তুতি গ্রহণ ও উপকরণ গ্রহণের পন্থা ২০৬
৭. পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতিভা ২১১
৮. সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণ রাজনীতি ২১৫
৯. বিজয়ী দলের গুণাবলি অর্জন ২১৭
১০. ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া এবং বীরদের বৈধ উত্তরাধিকার ২১৯
১১. আলিমদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা ২২১
১২. দুনিয়াবিমুখতা ২২৩
১৩. মোঙ্গল রাজপরিবারে অন্তর্দ্বন্দ্ব ২২৩
১৪. জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর রীতি ২২৫
সাত : আইন জালুতযুদ্ধের প্রভাব ও ফল ২২৬
১. মোঙ্গলদের দখলদারত্ব থেকে বিলাদুশ শাম মুক্তকরণ ২২৭
২. শাম ও মিসরের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা ২২৭
৩. মামলুকদের বিরোধীশক্তি দমন ২২৮
৪. পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয় ২২৯

৫. মানবেতিহাসের চূড়ান্ত ঘটনা ২৩০
৬. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নবজাগরণ ২৩১
৭. থেমে গেল মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা ২৩১
৮. ক্রুসেডার ও তাতারদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তির ব্যর্থতা ২৩২
৯. ক্রুসেডারদের দুর্বল অস্তিত্ব ২৩২
১০. কায়রো শহর ২৩৩
১১. বীর মামলুকদের রাজত্বের সূচনা ২৩৩
১২. আব্বাসি খিলাফতের প্রতীকী যুগ ২৩৪
১৩. মামলুক ফৌজের উন্নয়ন ও অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ ২৩৪
সারকথা **২৩৬**

# লেখকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মার অনিষ্ট ও আমলের ভুলত্রুটি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো; আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]
>
> হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন; আর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্তসম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]
>
> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলো শুদ্ধ ও পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আল্লাহ, আপনার মর্যাদা ও ক্ষমতার বিশালত্বের চাহিদানুযায়ী আপনার প্রশংসা, আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আপনার প্রশংসা, সন্তুষ্ট হওয়ার পরও আপনারই প্রশংসা। সকল প্রশংসা মহান প্রভুর জন্য, তাঁর মর্যাদা অনুপাতে। সকল স্তুতি মহান রবের জন্য, যা তাঁর পূর্ণতার উপযোগী। সকল স্তব মহান আল্লাহরই জন্য, তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদার চাহিদা অনুপাতে।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি *আল-মুগুল বাইনাল ইনতিশার ওয়াল ইনকিসার* গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ। গ্রন্থটিতে মামলুক তথা দাস সাম্রাজ্যের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। তাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদীক্ষা, বেড়ে ওঠা, জীবনাচার, শিক্ষা সমাপন ও সনদগ্রহণের বিশেষ রীতি, ভাষাগত ঐক্য, শিক্ষক-ছাত্র ও সহপাঠীদের মধ্যকার সম্পর্ক, তাদের কিনে নিয়ে যারা তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন; সেই উসতাজদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, সপ্তম ক্রুসেড আক্রমণ প্রতিরোধে তাদের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব ও গৌরবময় বীরত্ব, ক্রুসেডারদের পরাজয়ের কারণ ও তার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

১. মামলুকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।
২. মিশন বাস্তবায়নে ফরাসিদের ব্যর্থতা।

তারপর আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতন ও আইয়ুবি বংশের শেষ সুলতান তুরানশাহকে হত্যার ঘটনা আলোচনা করা হয়েছে। আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। যেমন :

১. সংস্কারমূলক কাজকর্ম থেমে যাওয়া।
২. শোষণ-নিপীড়ন।
৩. ভোগবিলাস ও প্রবৃত্তিপূজা।
৪. শূরাপদ্ধতি বাতিলকরণ।
৫. আইয়ুবি-পরিবারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত।
৬. খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিত্রতা।
৭. সভ্যতার বিনির্মাণে আইয়ুবিদের ব্যর্থতা।
৮. কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা।
৯. গোয়েন্দাবিভাগের দুর্বলতা।
১০. রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে হক্কানি আলিমদের অনুপস্থিতি।
১১. আল মালিকুস সালিহ নাজমুদ্দিনের মৃত্যু ও তাঁর যোগ্য উত্তরসূরির অভাব।

এরপর মিসরের সম্রাজ্ঞী শাজারাতুদ দুর (Shajarat al-Durr) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর বংশপরিচয় কী, তিনি আইয়ুবি ছিলেন নাকি মামলুক, সম্রাজ্ঞী হিসেবে তাঁর মিসরের ক্ষমতায় আরোহণ, তারপর নারী হওয়ায় আব্বাসি খলিফা, আলিম ও সাধারণ জনগণ কর্তৃক তাঁর নেতৃত্ব মেনে না নেওয়া, অবশেষে চাপের মুখে

তাঁর ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া, তারপর ইজ্জুদ্দিন আইবেককে ক্ষমতায় বসানো এবং তাঁকে বিয়ে করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে নারীনেতৃত্বের শরয়ি বিধান, ইজ্জুদ্দিন আইবেকের শাসনামলের রাষ্ট্রীয় সংকট ও বিপদ—যেমন : আইয়ুবি ও ক্রুসেডারদের বিপদ, মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সের অধিপতি নবম লুইয়ের (Louis IX) অপতৎপরতা এবং মুসলমানদের ক্ষতি করার প্রচেষ্টা, মিসর ও সিরীয় শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নবম লুইয়ের দূত প্রেরণ, মামলুক ও আইয়ুবিদের মধ্যে সমঝোতার ব্যাপারে আব্বাসি খলিফার উদ্যোগ গ্রহণ, মিসরে মামলুকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আরব গোত্রের বিদ্রোহ ও তা দমনে মামলুকদের পদক্ষেপ, বাহরিয়া মামলুক শাসক ফারিস আকতাইয়ের (Faris ad-Din Aktai) ইজ্জুদ্দিন আইবেকের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ানো, তারপর আইবেকের তাঁকে মেরে ফেলা, আইবেক আবার স্ত্রীসহ শাজারাতুদ দুরের হাতে নিহত হওয়া, তারপর শাজারাতুদ দুরকে হত্যা করে আইবেক-সমর্থকদের প্রতিশোধ নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে ইজ্জুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর তাঁর ছয় বছর বয়সি পুত্র আল মালিকুল মানসুর আলি ইবনুল মুয়িজের সিংহাসনে সমাসীন হওয়া; তারপর তাঁর কাছ থেকে সাইফুদ্দিন কুতুজের ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কুতুজের গৃহীত পদক্ষেপ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আইন জালুতের অবিস্মরণীয় যুদ্ধ ও মোঙ্গালদের পতন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতে বাগদাদ পতনের পর মোঙ্গালদের অব্যাহত যুদ্ধাভিযান, তারপর তাদের শাম ও আরব উপদ্বীপ দখলের আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাতারদের মোকাবিলায় কামিল আইয়ুবির পরিকল্পনা ও মায়াফারিকিনে[১] (সিলভান) তাঁর সাহসী প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর শাহাদাতবরণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নির্ভীক নগরী হিসেবে মায়াফারিকিনের সুখ্যাতি ছিল। কামিল আইয়ুবির নেতৃত্বে সেখানে ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধযুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশ্য শহরটিকে তাতাররা দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখায় অবরুদ্ধ আইয়ুবিদের সমস্ত রসদপত্র শেষ হয়ে যায়। তারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারির শিকার হয়। মিনজানিকের মাধ্যমে মোঙ্গালদের নিক্ষিপ্ত বিশাল বিশাল পাথরের বিরামহীন আঘাতে দুর্গের প্রাচীরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একপর্যায়ে শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা মৃত্যুবরণ করে।

[১] তুরস্কের প্রাচীন শহর। আধুনিক নাম সিলভান (Silvan)। শহরটি তুরস্কের দিয়ারবকর (Diyarbakır) প্রদেশে অবস্থিত।—সম্পাদক।

অবশেষে ৬৫৮ হিজরি—১২৬০ খ্রিস্টাব্দে জাজিরার[১] শেষ প্রতিরোধ-দুর্গটিরও পতন ঘটে। তাতাররা তখন বন্যার স্রোতের মতো শহরে প্রবেশ করে। মাত্র ৭০ জন অর্ধমৃত মানুষ ছাড়া সবাইকে তারা মৃত পড়ে থাকতে দেখে।

তারপর তারা কামিল আইয়ুবিকে গ্রেপ্তার করে। হালাকু খান তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত নৃশংস ও বর্বর আচরণ করে। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করার নির্দেশ দেয়। তাতাররা তাঁর গোশত টুকরো টুকরো করে হালাকুর মুখে তুলে দিতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তারপর তারা তাঁর মাথা কেটে বর্শায় বিঁধে শহরব্যাপী প্রদক্ষিণ করে। এটি ৬৫৭ হিজরি মোতাবেক ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। এরপর তারা দামেশকে পৌঁছে বাবুল ফারাদিসে (Bab al-Faradis) তাঁর মাথা ঝুলিয়ে রাখে। পরে সেখানকার বাসিন্দারা এসে ফটক থেকে সেটি নামিয়ে দাফন করে।

শামের শাসক সুলতান নাসির আইয়ুবি তাতারদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবেন নাকি প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন, এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কেননা, তারা তাঁকে চিঠির মাধ্যমে হুমকি দিয়ে আসছিল এবং বাগদাদ ও বাগদাদের খলিফার কী পরিণতি হয়েছিল, তা উল্লেখ করে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল। সুলতান নাসিরের উদ্দেশে পাঠানো এক পত্রে তারা লিখেছিল—

> *আমরা বাগদাদের খলিফাকে এনে তাকে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি; কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলে। তাই তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়। আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। সে বহু ধনরত্ন জমা করেছিল; কিন্তু মূলত সে ছিল ইতর। সে নিজে অনেক সম্পদ জমা করলেও অন্যদের জন্য কিছু করেনি। মানুষকে সম্মান করতে শেখেনি। সর্বত্র তার সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদা ছড়িয়ে পড়ে; আর এটাই তার ধ্বংসের কারণ হয়। আমরা আল্লাহর কাছে এমন সুনাম-সুখ্যাতি থেকে পানাহ চাই। জনৈক কবি বলেন,*
>
> *যখন কোনো বিষয় চূড়ান্ত উৎকর্ষ লাভ করে*
> *তখন তার পতন ঘনিয়ে আসে।*
> *তুমি যখন কোনো বস্তুর পূর্ণতা লাভের কথা শুনবে*
> *তখন তার বিনাশের অপেক্ষা করো।*
> *কোনো নিয়ামত পেলে তার কদর করবে, পাপাচারে ডুব দিয়ো না।*
> *কেননা, পাপাচার মানুষের নিয়ামত ধ্বংস করে দেয়।*

[১] মধ্য-এশিয়ার উত্তরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ভূখণ্ড। এটি বর্তমান সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব, ইরাকের উত্তর-পশ্চিম ও তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ছিল। আরবিতে এটাকে আল-জাজিরাতুল ফুরাতিয়া এবং ইংরেজিতে আপার মেসোপটেমিয়া (Upper Mesopotamia) বলা হয়। —সম্পাদক।

*কত যুবক ভোগবিলাসিতায় গা ভাসিয়েছিল*
*তারপর হঠাৎ একদিন মৃত্যু এসে তাকে ছোবল মেরে নিয়ে যায়।*

*সুতরাং এই পত্র হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি তোমার সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও ধনসম্পদ নিয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের দরবারে ছুটে আসবে। তার বশ্যতা স্বীকার করে নেবে। তাহলে তুমি তার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং তার আশীর্বাদ লাভ করবে—যেমনটি পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন—'মানুষ তার কৃতকর্মের ফলই লাভ করে; আর তার কাজ তাকে অচিরেই দেখানো হবে। তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে।' [সুরা নাজম : ৩৯-৪১]*

*'আর আমার দূতদের তোমার কাছে বন্দি করে রাখবে না, যেভাবে ইতিপূর্বে আটকে রেখেছিলে। হয় সদয়ভাবে রাখবে, নয়তো সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।' [সুরা বাকারা : ২২৯]*

*আমরা জানতে পেরেছি, শামের ব্যবসায়ীরাসহ অন্য অনেকেই মিসর থেকে পালিয়ে গেছে। তারা যদি কোনো সুউচ্চ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে আমরা পাহাড়সুদ্ধ তাদের ধসিয়ে দেবো। যদি কোথাও ভূ-তলে আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে সেখানেই পুঁতে ফেলব।*

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এ পদ্ধতিটি মোঙ্গালরা শত্রুদের বিরুদ্ধে খুব নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করত। এর মাধ্যমে প্রথমেই তারা শত্রুকে মানসিকভাবে কাবু করে মনোবল ভেঙে দিত।

যাইহোক, মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে মোঙ্গালদের যুদ্ধাভিযান অব্যাহত থাকে। তারা হালাব[৩] পদানত করে। দামেশক[৪] নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। শামে আধিপত্য বিস্তার করে। মুসলমানদের সঙ্গে পাশবিক ও বর্বরতামূলক আচরণ করে। অনুগত-অবাধ্য সবাইকে হত্যা করে। সিরিয়ার হালাব, দামেশক, হিমস,[৫] বালাবাক্ক,[৬] বানিয়াস[৭] ও অন্য অনেক অঞ্চল তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল; তবু তারা সেখানকার শাসনব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেয়। সেখানকার দুর্গ, প্রাচীর ও মসজিদগুলোর চিহ্ন পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। সেখানে গণহত্যা চালায়। নৃশংসতা ও বর্বরতায় ক্রুসেডারদেরও

[৩] আধুনিক নাম আলেপ্পো। সিরিয়ার অন্যতম বড় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ। এটি সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং রাজধানী দামেশক থেকে ৩১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।—সম্পাদক।

[৪] সিরিয়ার রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী। এটি একটি ঐতিহাসিক শহর।—সম্পাদক।

[৫] হিমস সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি শহর এবং হিমস প্রদেশের রাজধানী। আসি নদীর (Orontes River) তীরে এর অবস্থান।—সম্পাদক।

[৬] বর্তমান লেবাননের একটি শহর।—সম্পাদক।

[৭] সিরিয়ার উত্তর-পশ্চিমে তারতুস জেলার একটি শহর।—সম্পাদক।

ছাড়িয়ে যায়। ক্রুসেডাররা এতদিন চেষ্টা করেও এসব শহরে যা করে দেখাতে পারেনি, তারা তা করে দেখায়।

তারা নিকট-প্রাচ্যে[৮] যুদ্ধাভিযান পরিচালনার শুরু থেকেই প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিষ্টানদের আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করে এবং খ্রিষ্টানদেরও যথেষ্ট আনুকূল্য দেয়। বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়ের শুভ মুহূর্তে হালাকু খান খ্রিষ্টান রাজাদের পুরস্কৃত করে। তাদের উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে সুলতান মালিক নাসির ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। ভয়ে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। শেষপর্যন্ত হালাকুর হাতে বন্দি হন। পরে হালাকু যখন আইন জালুতযুদ্ধে মোঙ্গালদের পরাজয়ের সংবাদ শুনতে পায়, তখন রাগে-ক্ষোভে তাঁকে হত্যা করে।

মোঙ্গালদের হাতে শাম ও তার মিত্রশক্তিগুলো পরাজিত হওয়ায় সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করে। তাই তারা পালিয়ে মিসর অভিমুখে গমন করে। মিসরের মুসলিম শাসক তখন ইরাক ও শাম থেকে আসা মুসলিম মুহাজিরদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং মোঙ্গালদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ তখন মিসরের উপসুলতান ছিলেন। মূল সুলতান ছিলেন আইবেকের নাবালক পুত্র ছয় বছর বয়সি আল মানসুর আলি ইবনুল মুয়িজ। কুতুজ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, এই উদীয়মান সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে তাঁকে দুটি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একটি হচ্ছে, মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে মঙ্গোলিয়ার জান্তব তাতারদের নারকীয় আগ্রাসন রুখে দেওয়া। অপরটি হচ্ছে, মিসরের আলিমসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয়দের উপস্থিত করে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করা যে, নাবালক সুলতান আলি ইবনুল মুয়িজের পক্ষে মোঙ্গালদের সর্বপ্লাবী হামলার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। কুতুজ এ ব্যাপারে তাঁদের আশ্বস্ত করতে সমর্থ হন। তখন তাঁরা নাবালক সুলতানকে বরখাস্ত করে তাঁকে সুলতান হিসেবে গ্রহণ করেন।

যাইহোক, মোঙ্গালদের মোকাবিলার লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জোট গঠনের পরিকল্পনা নেন। অত্যন্ত শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন এবং বিরোধীদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করেন। সকল মত ও পথের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে রাষ্ট্রে ইসলামি শরিয়ত প্রণয়ন করেন। শায়খ ইজ্জুদ্দিন ইবনু আবদুস সালামের শিক্ষা ও নীতি গ্রহণ করেন। হালাকু খানের পত্রের তিনি এক চরম উত্তর দেন। পত্র নিয়ে আসা দূতদের বন্দি করে কায়রোর প্রধান ফটকের সামনে নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে তাদের

[৮] নিকট-প্রাচ্য (Near East) বলতে তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, মিসর ও তৎপার্শ্ববর্তী আরও কিছু অঞ্চলকে বোঝানো হয়ে থাকে। — সম্পাদক।

গর্দান কেটে ফেলেন। তারপর কর্তিত গর্দান কায়রোর বিখ্যাত প্রবেশদ্বার জুয়াইলার ফটকে (Bab Zuwayla) ঝুলিয়ে রাখেন। তবে দূতদের একটি শিশুকে হত্যা না করে নিজের গোলাম বানিয়ে নেন।

মিসরের মাটিতে মোঙ্গলদের মস্তক ঝুলানোর এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। এরপর শুরু হয় যুদ্ধের জন্য তাঁর প্রস্তুতি গ্রহণ। মুসলমানগণ সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভাবনীয় এক ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হন। তাঁদের এই বিজয়ের ফলে কার্যত শাম থেকে মোঙ্গলরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধে জয়লাভের পর দ্রুত মিসরে ফিরে যাওয়ার জন্য কুতুজ শাম তথা সিরিয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টন করে দেন। সেখানকার শাসনকাঠামো সুবিন্যস্ত করেন। এরপর তিনি মিসরের উদ্দেশে রওনা করেন; কিন্তু ফেরার পথে রুকনুদ্দিন বাইবার্স কিছু মামলুক সেনা সঙ্গে নিয়ে কৌশলে তাঁকে হত্যা করেন। সুলতানকে ঠিক কী কারণে হত্যা করা হয়েছিল, তা নিয়ে অবশ্য ইতিহাসবিদদের অনেক মত আছে। গ্রন্থের যথাস্থানে সেসব মত নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

তারপর আরও কিছু বিষয় নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে ইতিহাসের বিখ্যাত আইন জালুতযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের নেপথ্যে যে কারণগুলো সক্রিয় ছিল, সেগুলো নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কারণগুলো ছিল :

১. সুদৃঢ় নেতৃত্ব।
২. যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান।
৩. শক্তিশালী বাহিনী গঠন।
৪. ব্যাপক ভিত্তিতে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টি।
৫. যুদ্ধের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণ।
৬. যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণের অসাধারণ যোগ্যতা।
৭. সাইফুদ্দিন কুতুজের দূরদর্শিতা ও তাঁর প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব।
৮. মামলুকদের মধ্যে বিজয়ী দলের বৈশিষ্ট্য ও গুণসমূহের উপস্থিতি।
৯. ক্রমপর্যায় নীতি ও প্রতিরোধপ্রকল্পের উত্তরাধিকার।
১০. আলিমদের পক্ষ থেকে সাহায্য ও তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ।
১১. দুনিয়াবিমুখতা।
১২. মোঙ্গল রাজপরিবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।
১৩. জালিম ও সীমালঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে আল্লাহর চিরন্তন বিধান ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, আইন জালুতযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়লাভের একক কোনো কারণ ছিল না; বরং এর পেছনে অনেক কারণ সক্রিয় ছিল। সেগুলো আবার পরস্পর সংশিষ্ট ছিল। এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য উপরে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়া আরও অনেক কারণ ছিল। ইতিহাসের গ্রন্থাবলি চষে আমার পক্ষে যেগুলো উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে, আমি শুধু সেগুলো উল্লেখ করেছি। তবে আগ্রহী কেউ চাইলে গবেষণা করে আরও অনেক কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারেন, যাতে আমরা কোনো রাষ্ট্র ও জনগোষ্ঠীর উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের নেপথ্যের কার্যকারণ খুঁজে বের করতে পারি এবং সেগুলো থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি; আর এভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি আরেকটু বিস্তৃত করতে পারি। পাশাপাশি কোনো ভূখণ্ড জয় করতে বিজেতাদের যেসব বিচক্ষণতা, যোগ্যতা ও নেতৃত্বগুণ কার্যকারী ভূমিকা রাখে, সেগুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারি এবং ইসলাম ও মুসলমানের স্বার্থে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি।

আল্লাহ বলেন,

> তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা। এটি এমন বাণী, যা মিথ্যা রচনা নয়; কিন্তু মুমিনদের জন্য এটি পূর্বগ্রন্থে যা আছে, তার সমর্থন ও সবকিছুর বিশদ বিবরণ; হিদায়াত ও রহমত। [সূরা ইউসুফ : ১১১]

তারপর আইন জালুতযুদ্ধে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ফল ও প্রভাবসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে শুধু শিরোনামগুলো উল্লেখ করে দিচ্ছি :

১. মোঙ্গলদের দখল থেকে শাম পুনরুদ্ধার।
২. শাম ও মিসরে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
৩. মামলুকদের বিরোধী শক্তিগুলোর বিলুপ্তি।
৪. পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়।
৫. মানবেতিহাসের এক নিষ্পত্তিমূলক ঘটনা।
৬. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে নবপ্রাণের সঞ্চার।
৭. মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি রোধ।
৮. ক্রুসেডার ও তাতারদের মধ্যকার মৈত্রীচুক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া।
৯. কায়রোকে মামলুক সালতানাতের রাজধানী ঘোষণা।
১০. মামলুক সালতানাতের উত্থান।
১১. আব্বাসি খিলাফতের প্রতীকী শাসন।

১২. যুদ্ধোপকরণ ও ব্যবস্থাপনায় মামলুক সেনাবাহিনীর আরও উৎকর্ষসাধন করা।

মোঙ্গল ও তাতারদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে অবশ্যই তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হয়েছে। তখন আমি তাদের মিশনের প্রকৃতি, শক্তির উৎস ও দুর্বলতার দিকগুলো প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি কীভাবে তারা মুসলিমবিশ্বের ওপর আদের তুফান হয়ে নেমে এসেছে। বুখারা-সমরকন্দ-কাবুল-বাগদাদসহ বহু সমৃদ্ধ নগরী বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত করেছে। সেখানকার মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম হরণ করেছে। অপরদিকে তাদের শক্তি ও প্রতাপের মোকাবিলায় মুসলমানদের দুর্বলতা, নতজানু মানসিকতা ও এর নেপথ্যের কারণগুলোও গভীরভাবে লক্ষ করেছি।

সেই সঙ্গে লক্ষ করেছি, জালিমদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরন্তন নীতি ঠিকই যথাসময়ে কার্যকর হয়েছে। তাদের সবাইকে তিনি কঠিন শাস্তি দিয়েছেন; কাউকে কোনো ছাড় দেননি। তাঁর নিয়মে কোনো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়নি; কিন্তু তাঁর বিধান কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত মুসলমানদের (তাদের কৃতকর্মের কারণে) দুঃখ-দুর্দশা, হীনতা-দীনতা ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে তারা আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে শক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে। মামলুক সালতানাতের অধীনে আবার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তারা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছে, কীভাবে আল্লাহ তাকদিরকে তাকদির দিয়ে পালটা আঘাত করেন, যার ফলাফল ছিল আইন জালুতযুদ্ধে তাদের বিস্ময়কর সাফল্য।

এ যুদ্ধে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করেন। সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমরকৌশল ও শক্তিশালী সমরাস্ত্র ব্যবহার করেন। ফলে বিশ্বপরাশক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়া মোঙ্গালদের তিনি সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তুফানের বেগে ছুটে চলা তাদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়রথ থামিয়ে দেন।

কুতুজের লক্ষ্য ও গন্তব্য ছিল স্পষ্ট। ব্যক্তিত্ব ছিল স্বচ্ছ। ধর্মীয় চেতনার শিখা ছিল প্রজ্বলিত। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল পরিপক্ক। সমরশক্তি ছিল উন্নত। যেমন মানে, তেমনি গুণে। তিনি আলিমদের মর্যাদা ও ভূমিকা, জনগণের মধ্যে তাঁদের আত্মিক প্রভাব সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। ফলে তাঁদের কাছে টানেন। সম্মান করেন। যেকোনো প্রকার উপদেশ ও মত প্রদানে তাঁদের স্বাধীনতা দেন। আলিমদের জন্য তাঁর দ্বার সবসময় উন্মুক্ত রাখেন। এ কারণে দেখা যায়, আলিমগণ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁরা তাঁর ইসলামি মিশনে যোগদানের জন্য জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে এবং তাদের শীতল দেহে তপ্ত রক্ত ঢেলে দিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেন।

নিশ্চয় এই উম্মাহর ইতিহাস হচ্ছে চেতনার অনিঃশেষ বিপ্লব, জ্ঞান ও সভ্যতার

অফুরন্ত ভান্ডার, যা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করে, ইমান ও বিশ্বাসের মর্যাদা দান করে এবং মুমিন হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত করে। শুধু তা-ই নয়; জ্ঞান ও সভ্যতার এই ভান্ডার আমাদের বর্তমান বিনির্মাণ, সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন ও ইসলামি সমাজব্যবস্থার আলোকে এমন একটি মহৎ জীবন গঠনে সাহায্য করে, যার পরতে পরতে থাকবে আত্মার অনাবিলতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা ও ইবাদতের পরিশুদ্ধতা। ইসলামের শিক্ষা দ্বারা যে জীবন হবে সুসংহত এবং ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি হবে যে জীবনের সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার চালিকাশক্তি।

ইসলাম আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমরা যেন অতীত নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করি। কিন্তু অতীতে ফিরে না যাই; বরং অতীত থেকে যেন সামনে এগোবার পাথেয় সংগ্রহ করি এবং গৌরবময় অতীত ও সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করি। কিন্তু আমরা যদি অতীত নিয়ে শুধু গর্ব করি; আর পূর্বপুরুষদের সোনালি ইতিহাসের আলোচনায় বিভোর থাকি, তাহলে তা আমাদের মধ্যে একধরনের তন্দ্রাচ্ছন্নতা সৃষ্টি করবে। জাগ্রত ব্যক্তিকেও একসময় ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আমাদের জীবনীশক্তি হ্রাস করবে। আবার যদি নিছক ভবিষ্যৎস্বপ্নে বিভোর থাকি, সেটাও আমাদের নির্বোধ সাব্যস্ত করবে এবং আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিলোপ সাধন করবে। অনুরূপ যদি বর্তমান নিয়ে মেতে থাকি, তাহলে তা আমাদের সক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ এবং অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতাকে প্রকটরূপে তুলে ধরবে। আমরা বরং অতীত থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করব, ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য ও গন্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করব এবং বর্তমানকে খুঁটি ও ভিত্তি হিসেবে নেব।

আমরা সম্যকরূপে অবগত আছি যে, মুসলিম উম্মাহর হারানো গৌরব লেখালিখি, ভাষণ ও বক্তৃতার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। কেননা, স্বাধীনতার বুলি আওড়িয়ে কিংবা স্বাধীনতার সংগীত গেয়ে বেড়ি পরা কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে কখনো মুক্ত করা যায় না। এসব তার কোনো কাজে আসে না। অনুরূপ ক্ষুধার্ত বসে বসে অতীতের রসনাবিলাসের কথা মনে করলে তার ক্ষুধা কখনো নিবারিত হয় না। একসময়ের ধনী বসে বসে তার অতীত ধনাঢ্যতার কথা স্মরণ করলে তার দারিদ্র্য কখনো ঘুচবে না। লাঞ্ছিত ও অপদস্থ বসে বসে তার পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা রচনা করলে সে কোনোদিন তার লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবে না।

তবে আমরা এ-ও জানি, যে কারাবন্দি তার স্বাধীন জীবনযাপনের কথা ভুলে গেছে, সে পরাধীনতাকেই ভালোবাসবে; মুক্তির পথ খোঁজার চেষ্টা করবে না। যে দরিদ্র তার অতীত ধনাঢ্যতার কথা ভুলে গেছে, সে তার দরিদ্রতা নিয়েই পরিতুষ্ট থাকবে; সচ্ছলতা লাভের চেষ্টা করবে না। যে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের মর্যাদা ও

গৌরবের কথা ভুলে গেছে, সে তার অপদস্থ জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে; মর্যাদা ও গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে না।

সুতরাং আমরা যদি আমাদের গৌরবময় অতীত নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি, সারা দিন শুধু সেসবের স্মৃতিচারণ করি, কলমের আঁচড়ে তুলে আনি কিংবা বক্তৃতায় উল্লেখ করি, তাহলে কিছুতেই আমরা আমাদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারব না। বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আবার আমরা নিজেদের অধিষ্ঠিত করতে পারব না।

এভাবে আমরা যদি ভুলে যাই যে, আমরা পৃথিবীর শাসক ও জগদ্‌গুরুদের বংশধর, তাহলে এই হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে কোনোকিছুই আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে আন্দোলিত করতে পারবে না। কাজেই অতীতের যেসব বিষয় আমাদের ভবিষ্যৎপানে অগ্রসর হতে প্রেরণা জোগাবে এবং যা মহৎ ও কল্যাণকর, আমরা শুধু সেসব গ্রহণ করব। পক্ষান্তরে অতীতের যেসব বিষয় আমাদের কর্মোদ্যম নষ্ট করে ও স্নায়ুতে তন্দ্রাভাব এনে দেয়, আমরা সেগুলো সচেতনভাবে বর্জন করব। কেননা, আমরা কিছুতেই অতীতে ফিরে যেতে চাই না। কারণ, সময় কখনো থেমে থাকে না এবং যে সময়টা চলে যায়, তা আর ফিরে আসে না। তা ছাড়া আমাদের পক্ষে বর্তমানের আধুনিক জীবনোপকরণ ছেড়ে অতীতের জীবনধারায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা চাইলে আত্মপ্রত্যয়, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের উন্নত আদর্শ, নৈতিকতা ও মহৎ গুণগুলো অর্জন করতে পারি। কেননা, এসব আদর্শ ও গুণ স্বর্ণবৎ ও মণিমুক্তাতুল্য; সময়ের ব্যবধানে ও কালের বিবর্তনে যা কখনো তার মূল্য হারায় না। লোহার মতো মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যায় না। চিরমূল্যবান।[৮]

আমরা ইমান, তাকওয়া, সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতা ও পরিশুদ্ধ ইবাদতে সমর্পিত জীবনে ফিরে যেতে চাই। ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে চিরন্তন জীবনবিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাই। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র থাকতে চাই এবং মহান আল্লাহর এই বাণী অনুযায়ী নিজেদের পরিচালিত করতে চাই—

> তোমাদের যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদের অবশ্যই নিরাপত্তা দান

[৮] *ফুসুল ফিদ দাওয়াতি ওয়াল ইসলাহ* : ১৪।

> করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোনোকিছু শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারা তো সত্যত্যাগী। তোমরা সালাত কায়িম করো, জাকাত আদায় করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো। [সুরা নূর : ৫৫-৫৬]

মুসলিম উম্মাহ যদি নিজেদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি ও সমকালীন যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে চায়, তাহলে অবশ্যই সামরিক শক্তির পাশাপাশি অন্যান্য শক্তি অর্জন ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে সামরিক শক্তি অর্জনের বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহকে শক্তি অর্জনের সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরণ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, আল্লাহর দীন পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে শক্তি অর্জন একটি মাধ্যম। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা যেমন আবশ্যক, তেমনি তার জন্য শক্তি ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করাও আবশ্যক। কারণ, শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, যা ছাড়া কোনো অবশ্যকর্তব্য পালন করা যায় না, তা গ্রহণ করাও আবশ্যক। কাজেই আমাদের পূর্ণ শক্তি অর্জন করতে হবে। এটি আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর মাধ্যমে সন্ত্রস্ত করবে তোমাদের ও আল্লাহর শত্রুকে এবং এরা ছাড়া অন্যদের, যাদের তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদের জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। [সুরা আনফাল : ৬০]

অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে মুসলমানদের সমরশক্তিতে বলীয়ান হওয়া অত্যধিক প্রয়োজন। কেননা, বর্তমানে তাদের এমন বৈশ্বিক নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে, অস্ত্র ও শক্তির ভাষা ছাড়া যারা অন্য কোনো ভাষা বোঝে না। তাই তাদের অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্র দিয়েই করতে হবে। সাধারণ বায়ুর মোকাবিলায় টর্নেডো হতে হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে ভয়ংকর মারণাস্ত্রসমৃদ্ধ হতে হবে এবং শত্রুর দাঁতভাঙা জবাব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি ও অবহেলার সুযোগ নেই।[১০]

এবার মামলুক সম্প্রদায়ের আলোচনায় আসি। মামলুক সম্প্রদায়ের সেনাপতিগণ নিঃসন্দেহে মুসলিম উম্মাহর সামনে বীরত্ব, সাহসিকতা ও প্রাণোৎসর্গের মহাকাব্য রচনা করে গেছেন। তাঁরা তাঁদের শাসনামলে ইউরোপীয় ক্রুসেডার ও পূর্ব-এশিয়ার মোঙ্গলদের মতো এমন ভয়ংকর ও রক্তোন্মাদ দুটি অপ্রতিরোধ্য বিশ্বশক্তির মোকাবিলা

[১০] *ফিকহুন নাসরি ওয়াত তামকিনি ফিল কুরআনিল কারিম* : ১২৩-২২৪।

করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে নিজেদের ভোগে পরিণত করতে চেয়েছিল; কিন্তু তাদের সে আশা পূরণ হয়নি। লক্ষ্য অর্জনে তারা সফল হয়নি। কারণ, মামলুকগণ মুসলিম দেশ এবং নিজেদের দীনধর্ম ও নৈতিকতা রক্ষায় তাদের সামনে বাধার দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

মামলুকদের এ যুদ্ধ শুধু যে নিজেদের অস্তিত্ব ও সাম্রাজ্য রক্ষার লড়াই ছিল, তা নয়; বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল জিহাদ। এটি তাঁদের সর্বোত্তম নেক আমল ছিল। সেই সঙ্গে তাঁদের এ যুদ্ধ ইসলামি ইতিহাসের এক মহাকাব্য ছিল। মুসলিম উম্মাহ আজও যদি তাদের হারানো আত্মবিশ্বাস, গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে চায়, তাহলে মামলুকদের কীর্তি ও বীরত্বগাথা তাদের পথ দেখাবে। তারা তাঁদের ইতিহাস পড়ে দিক-নির্দেশনা লাভ করবে। কেননা, মামলুকরা যুদ্ধের ময়দান ও রাজনীতির অঙ্গনে তাঁদের যোগ্যতা, বীরত্ব ও সাহসিকতার কিছু অমর কীর্তি রচনা করে তখনকার মুসলিমবিশ্বের শাসক ও জনগণ সবার কাছ থেকে মর্যাদা ও সমীহ আদায় করে নেন। বিধর্মী অন্য রাষ্ট্রগুলোর অন্তরাত্মায় মুসলিমভীতি ছড়িয়ে দেন। তাই তারা মামলুকদের আক্রমণ ও রোষের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে তাঁদের সঙ্গে তোষণনীতি গ্রহণ করে। এভাবে মামলুকরা শত্রু-মিত্র সবার সমীহ আদায় করে নেন। সবাই তাঁদের সুদৃষ্টি লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। যার ফলে কায়রো বিরাট একটি রাজনৈতিক চাঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়।

অনেক ইতিহাসবিদ ও গবেষক মামলুকদের ইতিহাসের এই উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের যেমন প্রশংসা করেছেন, তেমনি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। তারা এই যুগকে মুসলমানদের অবক্ষয় ও অধঃপতন, পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বন্ধ্যাত্ব ও চর্বিতচর্বণের যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া প্রাচ্যবিদরা মামলুকদের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েও অভিযোগ তুলেছেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য হলো, মুসলিমবিশ্বে মামলুকদের যুগেই সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের সূচনা হয়।

ফরাসি প্রাচ্যবিদ গ্যাস্টন উইট (Gaston Wiet) এই বুদ্ধিবৃত্তিক কাজকে দ্বিতীয় শ্রেণির বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইতিহাসের কোনো কালেই কায়রো জ্ঞানবিজ্ঞানের সর্বোচ্চ মানের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল না; যেমন বাগদাদ ও কর্ডোভা ছিল। তবে হিজরি অষ্টম ও নবম শতক মোতাবেক খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে কায়রো একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। বিশেষ করে কায়রো তখন বিশ্ববাণিজ্য-কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এতৎসত্ত্বেও কায়রো তার শিল্পচর্চার উন্নত রুচি ধরে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে কায়রোর এই চর্চা ছিল দ্বিতীয় স্তরের।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ কার্ল ব্রুকেলম্যান (Carl Brockelmann) বলেন, মামলুকদের যুগের জ্ঞানমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টিকর্মে মৌলিকত্ব ও অভিনবত্বের কোনো ছাপ নেই বললেই চলে।[১১]

তবে দুঃখের বিষয় হলো, অনেক মুসলিম গবেষক—তন্মধ্যে আরবের কজন গবেষকও আছেন—মামলুকদের অবদানকে প্রাচ্যবিদদের মতো খাটো দৃষ্টিতে দেখেন। শুধু তা-ই নয়, এ ক্ষেত্রে অমুসলিম প্রাচ্যবিদদের গবেষণার প্রতি মুগ্ধতাও প্রকাশ করেন তারা; এমন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের হৃদয়!

এ সকল মুসলিম গবেষকের অধিকাংশের গবেষণাতেই মূলত অমুসলিম প্রাচ্যবিদদের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সত্যিকারার্থে এগুলো বস্তুনিষ্ঠ কোনো গবেষণা হয়নি, যাতে বিশেষ কোনো জ্ঞান-গবেষণার ছাপ লক্ষ করা যায়। ফিলিপ কে. হিট্টি (Philip K. Hitti) ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদের মূলনীতি অনুসরণ করে চলা এ সকল গবেষকের গবেষণা সংগত কারণেই বস্তুনিষ্ঠ হয়নি। এগুলোতে সম্পূর্ণরূপে কার্ল ব্রুকেলম্যানের মতের প্রতিফলন ঘটেছে, যিনি মামলুক যুগকে মৌলিক ও অভিনব সৃষ্টিশূন্য বলেছেন। আর কারও কারও গবেষণায় গ্যাস্টন উইটের মতের প্রতিফলন ছিল, যিনি মামলুকদের অবদানকে এমন খাটো চোখে দেখেছেন যে, আমার মনে হয় কোনো গবেষক যদি প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী শাসন করা মামলুকদের ওপর তার গবেষণাকর্ম শুধু *মুকাদ্দামা ইবনু খালদুনের* ওপর সীমাবদ্ধ রাখতেন, তাহলেই তিনি আর গ্যাস্টন উইটের বক্তব্যকে পাত্তা দিতেন না। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ মূর্খতা কিংবা বিদ্বেষ অথবা উভয়টির শিকার হয়ে মামলুক যুগকে অধঃপতন, অবক্ষয় ও স্থবিরতার যুগ বলে কলুষিত করার চেষ্টা করেছেন। দুঃখের বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে আমাদের ঘরানার অনেক গবেষক—যাদের আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুসারী মনে করা হয়—তাদের ছায়া মাড়িয়েছেন। তাদের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন; আর মামলুক যুগকে পশ্চাৎপদতা, অধঃপতন, অরাজকতা ও অবক্ষয়ের যুগ বলে মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালিয়েছেন।

বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ মামলুকদের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এই বক্তব্য দিয়েছেন। কেননা, ক্রুসেডাররা তাঁদের হাতে চরম মার ও ধাওয়া খেয়ে শাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়; পরবর্তী সময়ে তাঁদের মুখোমুখি হয়ে মোঙ্গালদেরও কোমর ভেঙে গিয়েছিল এবং বেদখল হওয়া গোটা শাম ও সেখানকার পবিত্র ভূমিগুলো তাঁরা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। হিজাজের স্বাধীনতা ফিরিয়ে এনেছিলেন। পরবর্তী প্রায় তিন শতাব্দী এসব অঞ্চল তাঁদের সে অবদানের সুফল ভোগ করেছে।

[১১] *তারিখুশ শুউবিল ইসলামিয়া* : ৩৭১।

একজন গবেষক যদি ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে মামলুকদের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন মামলুক যুগ আদৌ অধঃপতনের যুগ ছিল না; বরং তাঁদের শাসনামলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। বস্তুত মামলুক যুগ ছিল ইসলামি স্থাপত্যশিল্পের সোনালি যুগ। সহস্র মসজিদের শহরখ্যাত কায়রোর দিকে তাকালে এই ঐতিহাসিক সত্য আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। কায়রোতে রয়েছে বিমারিস্তান মানসুরি[১২] থেকে শুরু করে সুলতান হাসান জামে মসজিদ, বাইবার্সের খানকা, সুলতান আইবেক মসজিদ, ঘুরি ইত্যাদি আরও অনেক জামে মসজিদ।[১৩] কারুকার্যশোভিত এসব মসজিদ ও সেসবের আজানখানার বিশালতা ও নান্দনিকতা দর্শকদের চোখে সত্যিই বিস্ময় ও মুগ্ধতা সৃষ্টি করে।

শুধু কায়রো নয়, দামেশকেও মামলুকদের হাতে নির্মিত অসংখ্য স্থাপত্য-নিদর্শন ইসলামি ইতিহাসের সমুজ্জ্বল অধ্যায়ের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন : মাদরাসায়ে জাহিরিয়া ও তার পাশে অবস্থিত মাদরাসায়ে জাকমাকিয়া। সেখানে আরও একটি নান্দনিক স্থাপত্য-নিদর্শন রয়েছে, সেটি হচ্ছে জামে উমাইয়া মসজিদের পশ্চিম দিকের আজানখানা। ৮৮৪ হিজরিতে মসজিদটি পুড়ে যাওয়ার পর সুলতান কাইতবাইয়ের (Qaitbay) নির্দেশে এটি পুনর্নির্মিত হয়। এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে কয়েক মাস লেগে যায়।

স্থাপত্যশিল্পের পাশাপাশি মামলুকদের যুগে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য আর সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। এ সময় সাহিত্য, ইতিহাস, তাফসির, ফিকহ, হাদিস ও অন্যান্য শাস্ত্রে বড় বড় বিশ্বকোষ রচিত হয়। ফিকহ ও হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম নববি, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু রজব হাম্বলি, বাদরুদ্দিন আইনি ও ইবনু হাজারের মতো জগদ্‌বিখ্যাত জ্ঞানীগণ বিশাল বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো সবই মামলুক যুগে রচিত ও বিশ্বকোষের মানে উন্নীত। অনুরূপ ইতিহাসশাস্ত্রে রয়েছে শারফুদ্দিন ইউনিনি, আলামুদ্দিন বিরজালি, ইবনু কাসির, ইবনু খালদুন, ইবনু তাগরি বারদি ও শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনু আবদুল ওয়াহহাব নুওয়াইরির মতো মনীষীদের বিস্ময়কর গবেষণাকর্ম। এ ছাড়াও ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ে রয়েছে ইবনু ফাজলুল্লাহ শিহাবুদ্দিন আমরির

---

[১২] 'বিমারিস্তান' একটি ফার্সি শব্দ। অর্থ : চিকিৎসালয়, হাসপাতাল। 'বিমারিস্তান মানসুরি' হাসপাতালটি মামলুকদের হাতে ত্রয়োদশ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মামলুক সুলতান মানসুর কালাউন এ হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই এটিকে আল মানসুরি বলা হয়। এটি শুধু হাসপাতালই নয়; বাহরিয়া মামলুকদের হাতে নির্মিত স্থাপত্যশিল্পের এক অনন্য নিদর্শনও। এটি একটি বিশাল উদ্যোগ ছিল। এখানে নারী-পুরুষ, স্বাধীন-ক্রীতদাস, এককথায় সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষ চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারত। হাসপাতালটি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল; শুধু সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। উল্লেখ্য, সুলতান মানসুর হলেন বাহরিয়া মামলুক সালতানাতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসবিখ্যাত সুলতান রুকনুদ্দিন জাহির বাইবার্সের উত্তরসূরি। — অনুবাদক।

[১৩] *আল-আসরুল মুফতারা আলাইহি আসরুল মামালিকিল বাহরিয়া* : ১৩।

*মাসালিকুল আবসার* ফি মামালিকিল আমসার, আবুল আব্বাস কালকাশান্দির[১৪] *সুবহুল আ'শা*, তাকিউদ্দিন আহমাদ ইবনু আলি মাকরিজির *খুত্বাতুল মাকরিজিস*হ অন্যান্য বিশাল গ্রন্থ।

এ সকল মনীষী ইসলামি জ্ঞানের ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি তাতে অনেক কিছু সংযোজন ও নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করেন। তারপর জ্ঞানের সেই অফুরন্ত ভান্ডার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যান। ফলে আজ আমরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পারছি এবং আধুনিক কালের কায়রোর গোড়াপত্তন যে মামলুকদের হাতেই হয়েছিল; আর তাঁদের সময়েই যে কায়রো রাজনৈতিক সক্ষমতার পাশাপাশি সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেছিল, সে সম্পর্কে জানার পরিধি বিস্তৃত করতে পারছি।

স্থাপত্যশিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞান আর শিল্প-সাহিত্যের বাইরেও মামলুক সভ্যতার আরও একটি দিক রয়েছে, যা অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। সেটি হলো তাঁদের সামরিক শক্তির দিক। মাত্র এক বছর যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করে তাঁরা সুদীর্ঘ ৪৪ বছরব্যাপী (৬৫৮-৭০২ হিজরি) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মোঙ্গল ও ক্রুসেডাররা মুসলিমবিশ্বে যে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন চালিয়ে আসছিল, তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর অভূতপূর্ব এ অর্জন তাঁরা তাঁদের অসমসাহসিকতা, আকিদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং স্থাপত্য ও সমরশক্তিতে উৎকর্ষ সাধনের কল্যাণে লাভ করেছিলেন। সমরশক্তির এই উৎকর্ষের কল্যাণেই মুসলমানরা ফিলিস্তিনের আক্কা (Acre) স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। আর এটি ছিল মুসলমানদের জন্য একটি সুস্পষ্ট বিজয়, যে বিজয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কোনোক্রমেই পরবর্তী সময়ে বিজিত কনস্টান্টিনোপলের চেয়ে কম নয়। খোদ পশ্চিমারাও এ কথার সাক্ষ্য দেয়।

মামলুক সাম্রাজ্য মূলত আইয়ুবি ও তাঁদের পূর্ববর্তী অন্য শাসক ও মুসলিম সম্রাটদের সাম্রাজ্যেরই বিস্তৃত রূপ। এ হিসেবে আমরা বলতে পারি, মামলুক সাম্রাজ্য ঐতিহ্যবাহী সভ্যতার ধারক। তবে তাঁদের অধিকাংশ শাসক ছিলেন অনারব। সাধারণ মুসলমানরা যে যুদ্ধে অংশ নিতে ভয় পেত, তাঁরা তাতে নেতৃত্ব দিতেন। তবে অনেক গবেষক এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছেন যে, ৬৫৬ হিজরি—১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তি ঘটে। তাই তারা মামলুক যুগের কীর্তি ও অবদানের কথা জানার চেষ্টা করেন না; অথচ এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। তাদের এই ভ্রান্তি দূর করতে দীর্ঘ আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ইনশাআল্লাহ, পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে আমরা এই ভ্রান্তির নিরসন করব। সেই সঙ্গে মামলুক যুগের

[১৪] মৃত্যু ৮২১ হিজরি মোতাবেক ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

মনীষী এবং তাঁদের জ্ঞানমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করব।

নিশ্চয় এই উম্মাহ হলো মানবজীবনের স্পন্দন। তারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম। ইতিহাসের অনেক ঘটনার দ্বারা এ সত্যটি আরও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, ভীষণ বিপদ ও কঠিন দুঃসময়ে তাদের ভেতরের সুপ্ত শক্তি বিস্ফোরিত হয়। তাদের সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত হয়, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় এবং শোণিতধারা টগবগ করতে থাকে। তারা তখন সুদৃঢ় ইমান ও অবিচলতার মাধ্যমে অনায়াসেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এবং কঠিন বিপদ মোকাবিলা করতে পারে। এভাবে একপর্যায়ে আল্লাহ রাতের অন্ধকার সরিয়ে ভোরের উজ্জ্বল আলো পরিস্ফুট করেন।

সাহাবিগণ ও তাঁদের আসমানি বিজয়যাত্রা এবং উত্তমরূপে তাঁদের আদর্শ অনুসরণকারী তাবিয়িগণকে আমরা দেখেছি। তাঁদের মধ্যেও মুসলমানদের এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো সক্রিয় ছিল। এরপর যখন ক্রুসেডার ও মোঙ্গালবাহিনী মুসলিমবিশ্বের ওপর আক্রমণ চালায়, তখন সেলজুক, জিনকি, আইয়ুবি ও মামলুকরা তাদের মোকাবিলা করেন। ইসলামই ইমাদুদ্দিন, নুরুদ্দিন, সালাহুদ্দিন, সাইফুদ্দিন, রুকনুদ্দিনের মতো মহান সেনাপতি ও তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে জিহাদের চেতনা জাগ্রত করেছে।

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুসলমানদের মধ্যে এই যে অনিঃশেষ চেতনা, কবি হাশিম রিফায়ির চমৎকার একটি কবিতায় তা এভাবে বাঙ্ময় হয়েছে—

*আমি মুসলিম, আমি মুসলিম।*
*এটি আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে ওঠা সংগীত*
*হৃদয়ের গহীন থেকে আমি যার সুমধুর সুরলহরি শুনতে পাই।*
*আমার অন্তরাত্মা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও রক্তধারা*
*এক কথায় আমার সর্বসত্তা তখন তার সাথে সুর মেলায়।*
*এবং হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ও ব্যাকুল হয়ে*
*গেয়ে ওঠে আমি মুসলিম, আমি মুসলিম।*
*যদিও হিংসুকরা আমাকে হিংসা করে।*
*এই তো আমি এখানে,*
*সুস্পষ্ট সত্যের ঘাঁটিতে শরিয়তের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।*[১৫]

অপর এক কবি বলেন,

*তুমি কি ভেবেছিলে তোমার এক আঘাতেই আমার ধর্মের দাওয়াত মিটে যাবে?*

[১৫] *সালাতুল উম্মাহ ফি উলুয়্যিল হিম্মাহ* : ৬/৫১২।

*তোমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বড় নিকৃষ্ট ধারণা ছিল তোমার।*

*তোমার চাবুক ছিঁড়ে গেছে; অথচ আমার মনোবল এখনো কোষমুক্ত তরবারির মতো ধারালো ও তীক্ষ্ণ।*

*আল্লাহর কসম! জুলুম এক মুহূর্তের জন্যও দীনের দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।*

*ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমার এ কসমের অনেক সত্যতা রয়েছে।*

*আমার হাতে তুমি বেড়ি পরাও, চাবুকের আঘাতে আমার হাড়-পাঁজর সব ভেঙে দাও, আমার গলায় ছুরি চালাও,*

*তবু তুমি মুহূর্তের জন্যও আমার চেতনা রুদ্ধ করতে পারবে না; কিংবা আমার ধর্মবিশ্বাস ও ইমানের নুর ছিনিয়ে নিতে পারবে না।*

*কারণ, এই নুর আমার অন্তরে; আর আমার অন্তর আমার রবের হাতে। তিনিই আমার সাহায্য-সহযোগিতাকারী।*

*আমি আমার বিশ্বাসের রজ্জু আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকব এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নেব।*

নিশ্চয় যাঁরা জীবনবাজি রেখে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেমেছিলেন এবং মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের নাগপাশ থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র, শহর ও দুর্গ ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁরা সবাই সঠিক ইসলামি মিশনের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। সেই সঙ্গে বহিঃশত্রুদের মিশন ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ফলে তাঁরা অত্যন্ত সফলভাবে শত্রুর ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে সমর্থ হন এবং এ ক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতা ও পর্বতসম দৃঢ়তার পরিচয় দেন। সুতরাং কোনো জাতি যদি হোঁচট খেয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে চায়, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে তাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির স্মৃতিচারণ করতে হবে এবং সেসব ঘটনার মূলে যে শিক্ষা, উপদেশ ও কর্মপন্থা রয়েছে, সেগুলো আহরণ করে যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে; তবেই তাদের বর্তমান সমৃদ্ধ ও ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হবে। কেননা, বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতি ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের ভেতর দিয়ে গবেষক, সেনানায়ক, রাজনীতিক, শাসকসহ সকল শ্রেণির মানুষের সামনে পূর্ববর্তীদের জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়। এই জীবনচিত্র যদি তারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে তাদের পক্ষে বর্তমানকে পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎকে সমুজ্জ্বল করা অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই দেখা যায়, যে জাতি ইতিহাস পড়ে না, তারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর চিরায়ত নিয়ম ও চিরন্তন বিধান সম্পর্কে জানতে এবং

তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে না।

যেকোনো আন্দোলনের সফলতার জন্য ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম। এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই মানবেতিহাসের কোনো আন্দোলনকে ভাষা ও সাহিত্য উপেক্ষা করে সফলতা লাভ করতে দেখা যায় না। কেননা, লেখক, বক্তা ও আন্দোলনের প্রাণপুরুষগণ ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের মনোভাব জনগণের সামনে তুলে ধরে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেন। এভাবে একটি আন্দোলন সফলতা ও সার্থকতা লাভ করে। তা ছাড়া সংলাপ, সংঘাত, সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও অধিকার আদায়ের বিশ্বে কোনো আন্দোলনকে সফলতার বন্দরে পৌঁছাতে এবং কোনো মিশন কিংবা এজেন্ডা বাস্তবায়নে উপকারী গ্রন্থাদি রচনার ভূমিকাও অপরিসীম। বর্তমান বিশ্বে এটিকে চিন্তা-দর্শন, ধর্ম-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আদর্শ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামাধ্যম বিবেচনা করা হয়। কখনো কখনো এই প্রতিরক্ষার গুরুত্ব রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরক্ষার গুরুত্বকেও ছাড়িয়ে যায়।

উচ্চাভিলাষী ও সম্প্রসারণবাদী যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে ধর্ম-বিশ্বাস, চিন্তা-দর্শন ও সভ্যতা-সংস্কৃতি সক্রিয় থাকে। এগুলো আন্দোলনে প্রাণের সঞ্চার করে। ভাষা ও সাহিত্য শানিত তরবারির ভূমিকা পালন করে; আর বইপুস্তক সেই তরবারি ধারণকারী সৈন্যের ভূমিকা পালন করে। ফলে ভাষা ও সাহিত্যের সামনে অনেক সময় সামরিক শক্তিকেও হার মানতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা ক্রুসেড সম্পর্কে, সেলজুক, জিনকি ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির শাসনকাল সম্পর্কে এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্রুসেড-আক্রমণ সম্পর্কে রচিত গ্রন্থসমূহে; আর আমাদের বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ের এমন অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাব, সামরিক ও পেশিশক্তির মাধ্যমে যেগুলো কখনোই সমাধান করা সম্ভব ছিল না।

মামলুকদের ইতিহাসের এ অধ্যায়টি অবশ্যই এ কথার একটি সন্তোষজনক ঐতিহাসিক দলিল যে, মুসলমানদের মধ্যে যদি নিয়তের বিশুদ্ধতা, ইমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা, দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা, মেধার তীক্ষ্ণতা, সভ্যতার উৎকর্ষ ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে যেকোনো সময় তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে তাকে উন্নত ও সভ্য নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। মানুষকে মানুষের উপাসনা থেকে বের করে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে টানতে পারে। সংকীর্ণ পৃথিবী থেকে প্রশস্ত জগতের দিকে এবং ধর্মের অবিচার থেকে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

গ্রন্থটি আমি ১৭ সফর ১৪৩০; ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, বৃহস্পতিবারে সমাপ্ত করেছি। শুরু থেকে শেষ সারাটাই আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন কাজটি কবুল করেন, এ থেকে মানুষকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দেন এবং তাঁর দয়া-অনুগ্রহে এতে বরকত দান করেন। আল্লাহ বলেন,

> আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন, তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা ফাতির : ২]

আমি মহান প্রভুর দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণ করে আমার নড়াচড়া, স্থিরতা, জীবন-মরণ প্রতিটি পদক্ষেপ একান্তভাবে তাঁর কাছে সোপর্দ করা ছাড়া গ্রন্থটি সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না। আল্লাহই আমার স্রষ্টা, তিনি অনুগ্রহকারী, তিনি মহান, তিনি সম্মানিত, তিনি সাহায্যকারী, তিনি মহান উপাসক এবং তিনিই তাওফিকদাতা। তিনি যদি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন, আমাকে আমার বোধশক্তি ও সত্তার ওপরই ছেড়ে দিতেন, তাহলে আমার বোধশক্তি আমাকে ছেড়ে চলে যেত, স্মরণশক্তি উধাও হয়ে যেত, আঙুলগুলো শক্ত হয়ে যেত, জোড়াগুলো শুষ্ক হয়ে যেত, আমি অনুভূতিহীন হয়ে যেতাম, কলম লিখতে অক্ষম হয়ে যেত।

হে আল্লাহ, আমাকে আপনার পছন্দনীয় বিষয়গুলো দেখান এবং সেগুলোর জন্য আমার হৃদয় খুলে দিন। আর আপনার অপছন্দনীয় বিষয়গুলো থেকে আমাকে দূরে রাখুন এবং আমার হৃদয় ও চিন্তাচেতনা থেকে সেগুলো সরিয়ে দিন। আপনার সুন্দর নাম ও উত্তম গুণাবলির দ্বারা আপনার কাছে চাচ্ছি। আমার কাজ একনিষ্ঠভাবে আপনারই জন্য। সেটা মানুষের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। আমি যা লিখেছি এর প্রতিটি বর্ণের বিনিময়ে আমাকে সাওয়াব দিন এবং আমার সাওয়াবের পাল্লায় সেগুলো রেখে দিন। এ গ্রন্থ পূর্ণতায় পৌঁছাতে যে-সকল ভাই-বন্ধু সহায়তা করেছেন, সবাইকে আপনি উত্তম বিনিময় দিন। আপনি না চাইলে এটা অস্তিত্বে আসত না, মানুষের মধ্যে প্রচারও হতো না।

যত মুসলমান গ্রন্থটি সম্পর্কে জানেন সবার কাছে আমার আবেদন, আপনাদের দুআ ও মাগফিরাত কামনায় এ অসহায় বান্দাকে ভুলবেন না। আল্লাহ বলেন,

> হে আমার রব, আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য আমাকে আপনার শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দিন। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সূরা নামল : ১৯]

আমি এ গ্রন্থটি আল্লাহর এ বাণী দিয়ে শেষ করেছি,

> হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ইমান নিয়ে আমাদের আগে অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাদের ক্ষমা করুন এবং যারা ইমান এনেছিলেন, তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। [সূরা হাশর : ১০]

প্রভুর ক্ষমা, অনুগ্রহ, রহমত ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশী
**আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ সাল্লাবি**

তৃতীয় অধ্যায়

# মামলুক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন

- মামলুকদের মর্যাদাবৃদ্ধি ও উচ্চ পদপ্রাপ্তি
- মামলুকদের রাজত্বে শাজারাতুদ দুর ও ইজ্জুদ্দিন আইবেক

প্রথম পরিচ্ছেদ

# মামলুকদের উৎস ও উত্থান

## এক. মামলুক কারা

মামলুক শব্দের বহুবচন মামালিক। পূর্ববর্তী যুগ থেকেই বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যাদের বেচাকেনা ও সেবাগ্রহণ করা হতো, সেই দাসশ্রেণিকেই বলা হয় মামলুক। উমাইয়া শাসকদের যুগে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইসলামি সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করেছিল তুর্কি দাসরা। ইমাম তাবারি রাহ. বর্ণনা করেছেন, খোরাসানের উমাইয়া গভর্নর নাসর ইবনু সাইয়ার ১ হাজার তুর্কি দাস কিনে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে তাদের ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়েছিলেন।[১৬] মা-ওয়ারাউন নাহার (Transoxiana) ছিল তুর্কি দাসদের প্রধান উৎসস্থল।[১৭] আব্বাসিদের যুগে তুর্কি দাসদের সহযোগিতা সামরিক বিভাগ ছাড়িয়ে অন্যান্য বিভাগেও ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৮] সে কালে ক্রিমিয়া উপদ্বীপ, ককেশাস, কিপচাক, এশিয়া মাইনর, তুর্কিস্তান ও মা-ওয়ারাউন নাহারে দাস বেচাকেনার বাজার বসত। সে-সকল দাসের মধ্যে তুর্কি, সার্কাসিয়ান, রোমক, কুর্দি ও কিছু ইউরোপিয়ানও ছিল।[১৯] আব্বাসি খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ[২০] প্রথমে মামলুকদের দিয়ে একটি সামরিক ইউনিট গঠন করেন এবং তাদের পারসিক ও আরবদের স্থলাভিষিক্ত করেন। আর এরাই সেনাবাহিনীর তালিকা থেকে আরবদের নাম বিলুপ্ত করে দেয়।[২১]

খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর সেনাবাহিনীতে দাসের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বাগদাদ তাদের দ্বারা এমনভাবে ভরে গিয়েছিল যে, রাস্তায় মানুষের সঙ্গে তাদের ধাক্কা লেগে যেত। তাদের প্রভাবে বাগদাদবাসীরা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি তাদের

[১৬] *তারিখে তাবারি* : ৪৭।
[১৭] *তারিখু বাইতিল মাকদিস ফিল আসরিল মামলুকি* : ৪৭।
[১৮] প্রাগুক্ত; *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬১।
[১৯] *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬১।
[২০] খিলাফতকাল : ২১৮-২২৭ হিজরি—৮৩৩-৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ।
[২১] *তারিখু বাইতিল মাকদিস ফিল আসরিল মামলুকি* : ৪৭।

এবং অপরাপর তুর্কি দাস ও স্বাধীনশ্রেণির জন্য রাজধানী ও সেনা সদরদপ্তর হিসেবে সামাররা শহর নির্মাণ করেন।[২২] মুতাসিম বিল্লাহ পারস্য ও আরবের প্রভাব থেকে বাঁচতে সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তুর্কি দাস-সেনাদের দ্বারা সমান সহযোগিতা নিয়েছিলেন। তুর্কিদের প্রতি অগাধ আস্থার কারণেই তিনি বেচাকেনা, শিক্ষাদীক্ষা, সমরপ্রস্তুতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কেননা, তাদের মধ্যে পারসিকদের মতো এত লোভ ছিল না; আবার আরবদের মতো স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতিও ছিল না।[২৩] এ মামলুক সেনাবাহিনী খুব দ্রুত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো দখল করে নেয়। শেষপর্যন্ত এমন হয় যে, তারা যা চাইত তা-ই করতে পারত।[২৪] খলিফা মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (মৃত্যু ২৪৭ হিজরি—৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের হাতে একপ্রকার বন্দি হয়ে ছিলেন। তারা ইচ্ছা করলে তাঁকে অপসারণ বা হত্যাও করতে পারত![২৫] এভাবেই এ মামলুকবাহিনী খলিফাদের বিদ্রোহী দলে পরিণত হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনৈতিক হস্তক্ষেপ শুরু করে। ফলে রাজধানীকেন্দ্রিক ক্ষমতা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। যেহেতু বাহিনী ও নেতৃত্ব তখন তাদেরই হাতে ছিল, তাই স্বভাবতই আব্বাসি খিলাফতে তুর্কিদের প্রভাব বেড়ে চলেছিল; খিলাফতের কর্তৃত্ব যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরের মনে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের বাসনা জেগে উঠতে থাকে। এতে তুর্কি সেনাবাহিনী ও এর প্রধানরা বিচ্ছিন্নতাবাদ দমনে খলিফাদের অস্ত্রে পরিণত হয়। এভাবেই উসমানি শাসনামলে তুর্কি মামলুকদের কদর আরও বেড়ে যায় এবং তাদের অনেকেই গভর্নর, মন্ত্রী ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।[২৬]

মূলত আব্বাসি খিলাফতের প্রথম যুগেই মামলুক শব্দটা মুসলমানদের কাছে বিশেষ এক পরিভাষায় পরিণত হয়। তখন দাসবাজার থেকে যে-সকল শ্বেতাঙ্গ দাস কিনে আনা হতো, তাদেরই মামলুক বলা হতো। তারা বিশেষ সামরিক বিভাগে কাজ করত। আব্বাসিদের দ্বিতীয় যুগে খিলাফত যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতই তুর্কি দাসদের প্রয়োজন বেড়ে যায়। খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ছোট ছোট রাজ্য যেমন : মিসরের তোলুনিয়া ও ইখশিদিয়া,[২৭] খোরাসানের সাফারিয়া ও সামানিয়া[২৮] এবং ভারতের গজনবি ও ঘুরি—সবাই নিজেদের রাজ্য শক্তিশালী করতে তুর্কি দাস

[২২] *কিয়ামু দাওলাতিল মামালিকিল উলা* : ১২।

[২৩] *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬২।

[২৪] *কিতাবুর রাওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন; তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬২।

[২৫] *আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ* : ২২০।

[২৬] *তারিখুল মুগুল ওয়াল মামালিক* : ৬২।

[২৭] *আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার; তারিখু বাইতিল মাকদিস* : ৮৪।

[২৮] *তারিখু ইরান বাদাল ইসলাম* : ৯৭-১৬৭।